বিশ্বায়ন ও বাংলার গান

সুধীর চক্রবর্তী

আমাদের আধুনিক শিল্প সংস্কৃতির সবদিকে যিনি অগ্রপথিক সেই রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম একটি গানে ভাবতে পেরেছিলেন
বিশ্বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা - পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।-----

এই ভাবনার মধ্যে একটা ব্যাপ্তির বোধ আছে এবং রবীন্দ্রমানস যাঁরা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারেন তাঁরা নানাভাবে তাঁর রচনায় এমনতর বিস্বগণ চেতনার স্পর্শ পান। সবাই পাননা, তার কারণ বেশিরভাগ পাঠক দেশ কালে আবদ্ধ। সময়ের তাৎক্ষণিকতায় ও স্থানিকতায় তাঁরা থাকেন সংকীর্ণ হয়ে। রবীন্দ্রনাথ কখনও বলছেন এই বিশ্বের মধ্যে একজন পাগল আছে--- যা কিছু খামোখা সে-ই টেনে আনে। কখনও ভাবছেন এই পৃথিবী যেন নটরাজের ঋতুরঙ্গশালা। তার বিশ্বনৃত্যের এক চরণক্ষেপে রূপলোক ইন্মোচিত হয়, আরেক চরণক্ষেপে রসলোক উন্নথিত হয়ে ওঠে। একানেই শেষ নয় বিশ্বভারতীয় রূপকারের অনুভবের অত্যাশর্চ্য ব্যঞ্জনা। একটি গানে স্পষ্টতর করে বলেছেন
আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

নিজেকে ছাড়িয়ে এই বাইরে দাঁড়াবার আহ্বান আর কজনের জীবনে আসে? অন্তত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এসেছিল, বিশেষত তাঁর পরিবারের সূত্রে এবং সমকানীল ইংলন্ড তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্পপ্নিল স্পর্শে। তাই কৈশোর - যৌবনের সন্ধিকালে স্বল্পকালের প্রবাসজীবনে এবং জ্যোতিদাদার চর্চিত পিয়ানোর টুং টাং শব্দ তাঁর গানের কৈশোর-পর্বেই এনেছিল বিশ্বায়নের ঝংকার। কুড়ি বছর বয়সে রচিত তাঁর বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্য আসলে সুরের নাটিকা, যা এদেশে ছিল অপূর্বকল্পিত। ভারতীয় রাগরাগিণীর সঙ্গে বিলিতি সুরের চলন আর ঝোঁককে একসঙ্গে বেঁধে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর থেকে বোঝা যায় সংগীত সম্পর্কে তাঁর কোনো ছুৎমার্গ ছিল না এবং কোনো দেশের দান যে চিরকাল অনড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না, তার যে চাই মুক্তি, একথা বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই গানের সুর রচনার সময় তিনি অবাধে রাগমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, এমনকী সিদ্ধরাগের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর বর্ষার গানে এসে গেছে বাহারের সুর। এই ভাঙ্গাগড়ার রঙ্গ খেলায় দেশি - বিদেশি সুরের মিলনমিশ্রণ ঘটাতে তাঁর দ্বিধা ছিল না, কারণ বিশ্বসংগীতের উদার ধারণা তাঁর সৃজনশীল মনে ছোটোবেলা থেকেই গেঁথে গিয়েছিল। বিদেশে গিয়ে সেখানকার গানের জগৎ এক উদার সুরের ও আনন্দগানের দ্যোতনা তাঁর অন্তরে নবসৃষ্টির স্বপ্ন জাগিয়েছিল। প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার বলে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, তাই সেখানে জাগাতে চেয়েছিলেন নবসুর। উচ্ছ্বসিত উন্মুখ হয়ে উচচারণ করেছিলেন
জাগো জাগে রে জাগো সংগীত -- চিত্ত অম্বর করো তরঙ্গিত

বিশ্বায়নের তুমুল হুজুগের মধ্যে আজ মনে হয় নাকি, যে রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে প্রথম গান- জাগানিয়া? কেবল গান - জাগানিয়াই বা কেন? বিশ্বভারতীরর ভাবনার মধ্যেই তো ছিল বিশ্ববোধের প্রক্রিয়া। সেখানে অবশ্য শুধু নেওয়া নয়, দেওয়াও ছিল। পথের সঞ্চয় বইয়ের একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনথ বলেছিলনে, আশ্রমের বাতাবরণের সঙ্গে তিনি প্রতীচীর ভাবদর্শকেও মেলাতে চান। দুইয়ে মিলে বাজবে এক পূর্ণতার সুর-- যেন বিশ্বসংগীতের সমগ্রআভাস। বাংলা গানে বিস্বায়নের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা খুব ছোটোবেলাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলহার্বার্ট স্পেনসরের মতামত

নিয়ে। স্পেনসর বলেছিলেন মানুষের মনের বিচিত্র সব অনুভব, কল্পনা ও ভাবনাকে রূপ দিতে হবে সংগীতে। হর্ষ, বিষাদ, শোক, দুঃখ, মর্মযাতনা কিংবা হাসিকান্নার আভাস ফুটে উঠবে গানে। রবীন্দ্রনাথতাঁর গানের মধ্যে দিয়ে বাঙালিকে দিয়েছিলেন সেটাই। তারফলে বহু-দিনের বাংলাগানের বদ্ধ সোঁতায় এসেছিলেন সুরের আর চলশক্তির জোয়ার।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, দ্বিজেন্দ্রলালও। তিনি তো পুরোদস্তুরভাবে পেশাদারী দক্ষতায় বিলিতি গান আর তার স্বকীয় কণ্ঠব াদনের কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন রীতিমতো অর্থব্যয় করে। তার নমুনা ছড়িয়ে আছে তাঁর নানাবিধ গানের চলনে, সুরে, তালে। বিলিতি গানের সুরে যে-লঘুচপল লীলা, যে-ওঠানামা, যে- ওজঃভাব ও পৌষ তার পরাকাষ্ঠা দ্বিজেন্দ্রগীতি। স্কচ গ ানের নানা মজা ও দ্রুত উচচারণের কৌশল তিনি হাসির গানে ভরে দিয়েছিলেন। ছুৎমার্গী বাঙালি শ্রোতাদের তরফে কেউ কে তখনকার পত্র - পত্রিকায় প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানের জাত মারছেন। তখন প্রমথ চৌধুরী আগ বাড়িয়ে লেখেন যে, বিলিত সুরের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল যদি বাংলাগানের রাজকন্যার ঘুম ব াঙিয়ে থাকেন তবে সঠিক কাজ করেছেন।

একথা তখন না বুঝলেও এখন তো কার বুঝতে অসুবিধা নেই যে সুরের আকাশে কোনো ভেদ - রেখা টানা যায় না। ম াঠপ্রান্তর জনপদ সাগর ডিঙিয়ে এবং রাষ্ট্র সীমা পেরিয়ে সংগীত চলে আসে স্রষ্টার গ্রহিষ্ণু মনে আর শ্রোতাদের আনন্দ যজ্ঞে। তাই তো দেখি ভিনিসের গণ্ডোলা চালকদের কাছ থেকে শোনা গানের সুরে অতুলপ্রসাদ বাণী বসিয়ে বানিয়ে তে ালেন উঠ গো ভারতলক্ষ্মী-র মতো গান। দিলীপ কুমার রায় প্রান্সে গিয়ে বিশের দশকে রোমা রলাঁ - কে বাংলা গান গেয়ে শোনালে তিনি তার সুরের গভীরতায় নিমজ্জিত হয়ে উচছ্বসিত মন্তব্য করেন। সেই দিলীপকুমারই পঞ্চাশের দশকে য়ুরোপের নানা দেশে ঘুরে ঘুরে বাংলা গানের বহুতর নমুনা গেয়ে শোনান জার্মান বা ফরাসি অনুবাদে। তাতে বিদেশি শ্রে াতাদের তারিফ জুটেছিল। হাল আমলে সলি চৌধুরী যখন রাশিয়ান পোল্কার ছকেশ্যামলবরণী ওগো কন্যা কিংবা হ্যা পি বার্থ ডে- র সুরের ছাঁদে ক্লান্তি নামে গো রচনা করেন তখন তার রসগ্রহণে আমাদের কোনো বাধা ঘটেনি। নববইয়ের দশকে সুমন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গানে ও গায়নে ভরে দেন য়ুরোপীয় গানেরসুষমা। তাঁর যন্ত্রানুষঙ্গ ও গানের বিভটও তো বিদেশ ধাঁচেক। আমাদের গণসংগীতের নবীনতা ও সুরের ঝোঁকে যে বিদেশি ছোঁয়া ছিল সে তো এখন সবাই জানেন। বিটল্স্দের গানে আমরা আলাদাভাবে মোহিত হইনি? জন লেননের হত্যায় কে না কষ্ট পেয়েছে? তেমনই পপ্ রক, ব্রেথলেস গানের ধরন যুব সমাজকে বারবার আকৃষ্ট করেছে। মুম্বাইয়ের ফ্লিম ইণ্ডাষ্ট্রিতে সুরের বিদেশিয়ানা কতকাল ধরে তার থাবা বসিয়েছে। ও. পি. নারার, রাহুল দেববর্মন আর বাপ্পী লাহিড়ী সেখানে সারা ঝিকে এনে হাজির করেছেন।

তাই বলে উনিশ শতকে বিলিতিয়ানার মোহে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যে একটু বাড়াবাড়ি করে বসেছিলেন তা যেন ভুলে না যাই। সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভিক্টোরিয়া গাতিমালা, কিংবা কার কার গানে ইটালিয়ান ঝিঁজিট - য়ের উল্লেখ বেশ হাস্যকর। তবে এসব হল খণ্ডিত নমুনা এবং এ সবের মধ্যে বিস্ব- বোধের কোনো লক্ষণ নেই। বরং অনেক বেশি বিস্ব ায়নের প্রচছন্ন আভাস পাই শাখাপ্রসাখা ছায়াছবিতে যখন এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ভেসে আসে যোহান সেতবাস্টিয়ান বাখের একটি কম্পোজিশনের সুরধারা এবং দুজন কুশীলব সেই সুরকে বাখের রচনা বলে সনাক্ত করতে পারেন। তার মনে শাখাপ্রশাকা-র সত্যজিৎ রায় যে বিশ শতকের কাহিনী বলেন তার শিক্ষিতমধ্যবিত্ত নারীপুষ এতটাই সফিস্টিকেটেড যে যন্ত্রে বাখ্ বাজনা এবং তার রসগ্রহণ করতে পারেন। অদীক্ষিত শ্রোতাদের পক্ষে তারর রসগ্রহণে কোনো বাধা আসে না, তারাই তো এ-ছবির গরিষ্ঠসংখ্যক দর্শক। বাংলাগান ও ঝিায়ন প্রসঙ্গ তাই এবারে বোঝানো যায় বেশ কিছু বর্ণনা ও বিবরণ সহযোগে।

।। ২ ।।

সত্তরের দশকে আমি পায়ে হেঁটে সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিলাম বোলান নামে একরকম গ্রামীণ নাট্যগান। বোলান কথাটা এসেছে সম্ভবত বুলানো বা পরিত্রমার অর্থে। এর স্থানিকরূপায়ণের অঞ্চল হল প্রধানত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূমের খা নিকটা লাগোয়া জনপদ। গাঁয়ে গাঁয়ে চৈতালি ফসল যখন ওঠে, কৃষককের ঘরে লাগে সামান্য সচছলতার ছোঁয়া, আসে কদিনের অবসর, তখন বেলানের দল গড়ে লোকনাট্যের ছাঁদে অভিনয় আর গা গেয়ে বোলানের পার্টি ঘুরতে থাকে। এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। গুরতে ঘুরতে এমনকী পার হয়ে যায় তারা জেলার সীমানা। বোলান হল খাঁটি গ্রামীণ গান আর ত

ার শ্রোতারাও গ্রামীণ গান আর তার শ্রোতারাও গ্রামীণ। চৈত্র সংক্রান্তির কদিন আগে থেকে বোলানের দল বেরোয়, ত াদের বুলানো শেষ হয় সংক্রান্তির রাতে। এর প্রস্তুতি চলে বেশ কদিন আগে আগে থেকে। প্রথমে গান বাঁধা হয়, লেখা হয় একটা খাতায়। তারপরে গাঁয়ের কার বাড়িতে চলে মহড়া, কয়েক সন্ধে ধরে। তারপর বাজনাবাদ্যি নিয়ে, মেকআপ নিয়ে, শু হয় পরিক্রমা। ছেলেরাই মেয়ে সাজে। মাঝে মাঝে চলে গাঁজা কিংবা মদের চর্চা, নইলে অত শারীরিক ধক সাইবে কেন? বোলানের তিনটে অঙ্গ--- নৃত্য, গীত ও অভিনয়। গ্রামে গ্রামে থাকে অপেক্ষাতুর শ্রোতা বা দর্শক। ঐ আসছে বোলান পা র্টি শিশুদের কণ্ঠে এমনতর কলভাষ শুনলেই বোঝা যায় বোলানের দলকে দেখা গেছে দূর থেকে কিংবা শোনা গেছে ত াদের সম্মেলক গানের সুর। এবারে তারা এসে পড়বে কোনো সম্পন্ন চাষার অঙ্গনে বা ধনী গেরস্থরউঠোনে। সারা পাড়া ভেঙে পড়বে গান শুনতে--- নারীপুষ। সবচেয়ে উৎসাহ কিশোর কিশোরীদের। বেশ কিছুক্ষণধরে পালা শেষ করে একটু বিশ্রাম নেবে দল। গেরস্থ দেবেন কিছু খেতে, সঙ্গে কিছু টাকার দক্ষিণা । ব্যাস । এবারেচলে আরেক পাড়ায়। বাচচারাও প ায়ে পায়ে চলল। শুনতে শুনতে সব পালটাই তাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। তারপরে কদিন ধরে গাঁয়ের কজন সেই বোলানের গান গেয়ে চলে। কিন্তু সমস্যা হল কটা গান আর মনে রাখবে ? বোলানপার্টি তো একটা নয়, অন্তত বিশ পঁচিশটা। এই আসছে তরণীপুরের দল, ওই আসছে খামারপাড়া, এবারে এখনওতোদেবীপুরের দেখা নই। সবচেয়ে বড় আর জাঁকালো দল অবশ্য সর্বাঙ্গপুরের। তাদের আসতে দেরি আছে। শব্দনগরের দলে এবার গিটার, বঙ্গো আর ক্যাসিও বাজছে।

সাহেব নগরের ফণী দরবেশ গানের মানুষ। পঁচাত্তর বছরের পেটানো শরীর। সত্তরের দশকে তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে বলেছিলেন, বয়সকালে বোলান পার্টি আমাদেরও ছিল।

---তার কথা কিংবা সুর মনে আছে?

---আছে। তবে এখনকার সঙ্গে মিলবে না। তখন ররীতিমতো রাগরাগিণীর চর্চা ছিল। আমাদের বিড়ি তামাক খাওয়া ছিল নিষেধ। ওস্তাদের কাছে গান তুলতে হত একমাস ধরে। আদ্ধা, আড়খেমটা, মধ্যমান এসব কঠিন তাল ছিল। এখনক ার ছোঁড়ারা সেসব জানবে কোথা থেকে ? গাঁয়ে তেমন ওস্তাদই বা কই ? সবই ফোকতারা । এখন ক্যাসেট বাজিয়ে হিন্দি গানের সুর তুলে তারই ছাঁচে গান বাঁধে, সবই হল নকলদানা হুস্।

---আপনাদের সময় বাজনা কী কী থাকত ?

--- ঢোল, সানাই আর কাঁসি। ব্যাস। আর এখন ? সব ইংরিজি বাদ্য। হারমোনিয়ামের কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু এই গিটার আর ব্যাঞ্জো --- কানে ঝ্যাঁটা মারে। আর ওই ক্যাসিও নাকি এক যন্তর উঠেছে --- যন্তর নয় যন্ত্রণা। ঢোল কই ? এখন বলে বঙ্গো।

তার মানে সেই সত্তর দশকেই সায়েব নগরের মতো গাঁয়ে এসে গেছে ঝিায়নের ছাপ, অন্তত যন্ত্র - বাদ্যে। আর যে হিন্দিগ ানের সুরটা নকল করা হল তাতেও তো বিদেশি চলন।

তো সেবারে শোনা গেল পলাশীর কাছে বড়চাঁদঘর গাঁয়ে অর্জুন দাসের বাড়িতে নাকি অনেক বোলান গানের খাতা অ াছে। আমার সংগ্রহের নেশা তাই জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ মাথায় নিয়ে তিন াইল হেঁটে পৌঁছেছিলাম ভরদুপুরে দাসবাড়ি। তখনও ওসব টে অটো বা রিকশা চালু হয়নি। হেঁটেই যেতে হল তাই। দাসমশাই আমার বৃত্তান্ত শুনে তো অবাক। বাড়ির সবাইকে ডেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন, সরবত দাও, বাতাস করো। শোনো এবার কাণ্ড।

আমি লজ্জিত হই। দাসমশাই হেঁকে বলেন, শোন বৃত্তান্ত--- এই ভদ্রলোক শহর থেকে এসেছেন আমাদের গ্রাম্য গানের খোঁজে। কী না আমাদের ছোটলোকদের বোলান গান। যাদের বলে চাষা বুদ্ধিনাসা তাদেরও গান এবারে জাতে উঠল।

আমার অধোবদন হবারই কথা। এমন কীই বা করেছি। মনে পড়ে গেল মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন বা চন্দ্রকুমারদের মতো সংগ্র াহকদের কথা। কী সব গহিন গ্রামে ঘুরছেন না খাওয়া না দ্যায়া। আর আমি তো দিব্যি ট্রেনে চড়ে এসে পলাশী স্টেশনে নেমে তিন মাইল মাত্র হেঁটেছে। তাতেই এত সোরগোল ? কিন্তু সে কথা থাক, অর্জুন দাসের ব্যাপারস্যাপার।

তিনি তো আমাকে পাত্তাই দিচ্ছিলেন না--- বোলান গান? ওসব হবে খ ন। এসেছেন মৃদু হেসে বললেন, বোলান গানের খাতা নিয়ে আর কী হবে ? নিয়ে যান এই টেপ কটা। এতে দশটা পালা আছে। এটা আধুনিক যুগ বুঝলেন ? রেকর্ডার যন্ত্রটা আমার ছেলে দিয়ে গেছে--- লন্ডনে থাকে, বুঝলেন ?

।।৩ ।।

১৯৯৯ সালে জুন মাসে আমাকে যেতে হয়েছিল আমেরিকা। প্রথমে নিউইয়র্ক, সেখান থেকে ডালাসের আভিং শহরে। সেখানকার প্রবাসী বঙ্গসন্তানরা একটা সম্মেলন তাঁরা খুব সমাদর করে এবং বলাবাহুল্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে। সংস্থাটির নাম ‘বড়ন্দ্ব ট্রস্তুস্তন্দ্বপ্তন্ত স্নন্দ্র ক্রন্দ্বপ্ত্র ট্রজন্দ্বন্দ গু ট্রন্ত্বপুন্দ্বত্বজন্দ্ব’, সংক্ষেপে ‘ট্রচট্রট্র’ বা বাংলা উচচারণে অবাক। দেখে অবাক হলাম যে সদস্যদের মধ্যে পনেরো আনাই বাংলাদেশের মানুষ। বাকিরা পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালি। দূর প্রবাসে নিতান্ত ভাষার টানে আর নাড়ির যোগে তাদের মর্মমিলন ঘটেছে। বাংলা তাদের মাতৃভাষা কিন্তু তাদের নতুন প্রজন্ম তেমন করে বাংলা জানে না। তারা দ্রুত ভুলে যাচ্ছে বঙ্গ সংস্কৃতি আর বাঙালি জীবনের ঐতিহ্য, অথচ চারপাশে বিশ্বায়নের জোয়ার আর কম্পিউটারের প্রতাপ। শুধু বাংলা ভাষা নয়, তারা চর্চা করতে চায় বাংলা গান, কবিতা, নাটক। আঁকতে চায় আলপনা। তাই প্রতি শনি আর রবিবারে গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে তাঁরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের ছোটো ছেলেমেয়েদের এসব কলা বিদ্যা চর্চা করাচ্ছেন। দুয়েক বছর অন্তর পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ থেকে শিল্পী সাহিত্যিক গায়ক বাদকদের সেখানে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান করছেন, সেমিনার করছেন। আকুল আগ্রহে শুনতে চাইছেন তাঁদের কথা। এ ব্যাপারে তাঁরা রাষ্ট্রীয় বিভাজন ভুলে গেছেন। রাশেদ হোসেন, সৌম্য দাশগুপ্ত, আশরফ জাহাঙ্গীর সেখানে একই সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগঠন করছেন। শিমূল কিংবা মিঠুর মতো তণী গৃহবধু (যারা কিন্তু গাড়ি চালিয়ে গিয়ে চাকরিও করে) বাচচাদের নাচ গান আলপনা শেখাচ্ছে। সত্যিই খুব অবাক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বায়নের দাপটে তারা কাবু। ইয়াঙ্কি কালচারের তীব্র ঝাপটা থেকে জাতিসত্তাকে বাঁচাতে কী তাদের কণ আকলতা। উত্তর আমেরিকার নানা জায়গা থেকে কতরকম বাঙালি নারীপুষ এসেছিলেন সেই সম্মেলনে--- কত কথাবার্তা, খানাপিনা, ভাববিনিময়। আভিং আর্ট সেন্টারের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের তিনটি বিশাল মঞ্চে তিনিদিন ধরে একটানা অনুষ্ঠান সকাল দশটা থেকে রাত একটা-দুটো পর্যন্ত। উপচে পড়া ভিড়ে। তা মধ্যে একটা জায়গায় বিত্রি হচ্ছে বাংলার তাঁতের শাড়ি, ধুতি--- ঢাকাই জামদানী, টাঙ্গাইল, বালুচরী আর মুর্শিদাবাদী সিল্ক। লন্ডন আর জামার্নি থেকে উড়ে এসেছেন কজন প্রাণের টানে। নিউইয়র্ক থেকে এসেছেন অধ্যাপক সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় আর তাজুল ইমাম। বাংলা গান গাইবেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানটির স্মৃতি এখনও মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আর্ভিং আর্ট সেন্টারের মূল মঞ্চ বিসালল আর চওড়া। সামনে একটা সুদৃশ্য পোড়িয়াম। মঞ্চে পরপর পঞ্চাশটা চেয়ার পাতা। আমরা আমন্ত্রিত গুণীজনরা পরে সেখানে বসব, পরিচয় ঘটবে দর্শকদেরর সঙ্গে, তাঁদের সংখ্যা হাজার দুয়েক। প্রথমে আমরা বসেছিলাম দর্শকাসনেরপ্রথম সারিতে। অনুষ্ঠান শুর আভাস মিলল পর্দা সরে যেতে। অনতি উদ্ভাসিত মঞ্চপট, তাতে আয়তাকারে আঁকা তিরিশফুট একটা ছবি--- বাংলার গ্রাম। এবারে আস্তে আস্তে উইংসের দুপাশ দিয়ে হাতে প্রদীপ নিয়ে ঢুকল পঞ্চাশ একশোজন তণ-তণী, সাদা পোশাক পরা। প্রদীপগুলি ফ্রন্ট স্টেজে পরপর সাজিয়ে দিয়ে তারা গেয়ে উঠল   আমরা বাংলার গান গাই।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের এই গান কতবার শুনেছি, এমনকী তাঁর নিজের গলাতেই এবং তাঁর সেই বিখ্যাত স্বরক্ষেপণ তবু এ রোমাঞ্চের তুলনা হয় না। কত শত মাইল দুরে এসে গেছে এখনকার একটা মরমি বাংলা গান। বাংলা গানের বিশ্বায়নের এত বড় দ্যোতনা আমরা ভাবতেই পারি না। দুই স্বাধীন দেশের এক ভাষাভাষী ছেলেমেয়ে একত্রে গাইছে এমন এক গান যাতে ফুটে উঠেছে গানের দীপ্ত উদারর আকাশ। রাষ্ট্রনৈতিক কারণে বিভাজিত ছাড়পত্র ছাড়া দুদেশে যাবার স্বাভাবিক পথ নেই, কিন্তু সমভাষার গান সকলকে এক করে দিল। আমরা আবেগে সবাই উঠে দাঁড়ালাম। একটা সামান্য ক্যাসেট বাহিত হয়ে প্রতুলের গান চলে এসেছে এতদূরে ? আর আজ ঘটল তার এখন আন্তর্জাতিক ব্যবহার ?

বিস্ময়ের তখনও অনেক বাকি ছিল। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি ঘোষিত হল   এবারে গাইবেন নিউউয়ক থেকেআগত তাজুল ইমাম। মুক্তিযোদ্ধা যুবক তাজুল ইমাম একতারা বাজিয়ে গান ধরলেন, সঙ্গে দুলান নন্দীর দোতারা আর সুদীপ্ত-র গীটার। গানের বেবদনা আমাদের নিমেষের মধ্যে ছুঁয়ে গেল। বাংলাদেশের বাউল গীতিকার আবদুলকরীমের গান

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান।
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটু গান গাইতাম।

বর্ষা যখন হইত গাজির গান আইত
রঙ্গে ঢঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম।
বাউলা গান ঘাঁটু গান আনন্দেরই তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম---
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।
হিন্দু বাড়িন্ত যাত্রাগান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম।
মনে ভাবনা সেদিন কি পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম...

দুলাল আর দাজুলের গান হয়েই চলেছে। সকলের চোখ জল। যেদিন চলে যায় তা কি আর ফেরে? শান্তিসৌভ্রাত্রের সেইসব স্মৃতিকাতর সানন্দ যাপন... হিন্দু মুসলমানের দেশজ লোকচর্চা... বাউল্যা ঘেঁটু সারি গ্রামীণ যাত্রা... সেসব আজ আর কই? এখন ঝকমকে বিষাদে বেদনায় নড়েচড়ে ওঠে। গানের বিস্ব তাদের নিমজ্জিত করে হারানো শৈশবে। উৎসন্ন প্রব াসী জীবন, নির্বাসিত সত্তা, কেঁদে ওঠে গানের ভাষায়। তখন যন্ত্রের দাপট ছিল না, প্রাণের ভাষা হারিয়ে যায়নি, বিদেশি জ্যাজ বা রক ঢেউ তোলেনি নদীমাতৃক ভাটির দেশে। বিশ্বায়ন এসে কণ্ঠের গান কেড়েনিল।

অভিজ্ঞতা আর মর্মান্তিক হল পরের দিন সেমিনারে। এখানে ভিড় কম। আগ্রহী মরমি শতখানেক নারনারীবসে আছেন বিদ্বজ্জনদের কাছে দু-কতা শুনবেন বলে। ছোটো হল কিন্তু কবোষ্ণ পরিবেষ। মাঝে মাঝে আসছে সুপেয় কফি। এই তো বসে আছে এখন লন্ডনের সাংবাদিক সেই বিখ্যাত আবদুল গাফফার চৌধুরী। ওঁরা লেখা সেই গান মনে পড়ে। আমার ভ াইয়ের রক্ত রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলিতে পারি ?

ভাবতে গেলে এও তো কম বিস্ময়কর নয় যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আর তার আগের পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন আমাদেরই বলে মনে করেছি পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন। তাঁদের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। বিশ্বায়ন তো সেটাও--- গানের বিশ্বায়ন। কিন্তু ভাবনা পূর্ণতা পায় আভিংয়ের সেই ছোটো ঘরের সেমিনারে যখন গাফফার চৌধুরী আর আমি বাসি পাশাপাশি। লন্ডনপ্রবাসী গাফঁফার তাঁর বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছেন গানের অভিমান। সুদূর ডালাসে দুজনের এই প্রথম দেখা হল।

একসময় আমার ডাক পড়ল ভাষণ দেবার জন্য। বিষয় একশো বছরের বাংলা গান। ঠিক করেই গিয়েছিলাম বক্তৃতার কথাগুলি প্রাঞ্জলভাবে বোঝাবার জন্য মাঝে মাঝে গাইব বেশ কটা ববাংলা গান। বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে সামনের বেশিরভাগ শ্রোতাই নতুন প্রজন্মের। কিছুক্ষণ আগে লন্ডনের চিরপ্রবাসী কেতকী কুশারী ডাইসন তাঁর ভাষণে ডায়াস্পোর ার সমস্যা বোঝাচ্ছিলেন। নতুন প্রজন্ম তাঁর কথার নড়ে চড়ে বসল--- তর্ক করল অনেকে। কিন্তু আমি ভাষণের প্রাক্ মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম এদের বেশিরভাগ জন্মেছে দেশ বিভাগের পরে। অখণ্ড বাংলার স্মৃতি এদের নেই, হয়তো শে ানেইনি আগেকার বাংলা গান। তবে প্রবীন মানুষ দুচারজন ছিলেন এই যা ভরসা। কিন্তু ধারণা আর আশঙ্কা পাল্‌টে গেল যেই ধরলাম ধনধান্যপুষ্পভরা গানটি। সে কী ছলোছল চোখ ! স্বপ্ন দিয়ে তৈরিআর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা তো তাদেরও বাংল াদেশে! যে- দেশ তারা ছেড়ে এসেছে পেটের টানে। অতুলনীয় জন্মভূমির জন্য আর্তি আর স্বপ্ন কার নেই? বিশেষ করে ব্যথাতুর লাগছিল শ্রোতাদের মধ্যে সেই বিপন্ন মুখগুলি যারা মুক্তিযুদ্ধের সেনানী--- বারবারের জন্য আশ্রয় নিয়েছে বিদেশে। দেশ ফিললে তাদের নিশ্চিত মৃত্যু।

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি গানটিতেও সবাই সাড়া দিল। শহীদের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ আর তার মৃত্যু পরবর্তী পুনরাগমনের বাসনা বড় মর্মান্তুদ। তাতে দেশকালের বেড়া নেই। ক্ষুদিরাম যেন সব শহীদের প্রতীক। তার মরণ নেই। দেশের জন্য আত্মদান করেছে একাত্তরের যেসব মুক্তিযোদ্ধা, এই গাননে যেন তাদেরও মনে করা। এ সব গান তো অ াগেও কত গেয়েছি কিন্তু এমন নতুন ব্যঞ্জনা আগে বুঝিনি। বিশ্বের সঙ্গে কোন অলক্ষ অনর্যোগে তা বেঁচে আছে।

বিদেশের আসরের স্বদেশের গান গাওয়া, তাকে নতুন করে পাওয়া যেন এক নিগুঢ় অনুভব। শ্রোতাদের কোনো দেশকাল জাতধর্ম থাকে না। শ্রেষ্ঠ রচনা সকলের জন্য--- এ আমি নতুন করে বুঝলাম। অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রাপেল যখন গাইলাম গগন হরকরার আমি কোথায় পাব তারে এবং তার থেকে ভাঙা রবীন্দ্রগান আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোব

াসি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে লেখা এই গান ১৯৭১ - য়ে হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। গানের কী প্রসারণ। আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন। সে অনুভবের কোনো তুলনা নেই। আমার এক ঘন্টা ব্যাপী ভাষণের একবারে শেষে গাইলাম বঙ্গ আমার জননী আমার ধত্রী আমার আমার দেশ। সকলে অভিভূত, বাক্যহারা। সত্যিই তো কীসের দুঃখ কীসের দৈন্য কীসের লজ্জা কীসের ক্লেশ? যদি সব বাংলাভাষাভাষী মিলিত কণ্ঠ বলতে পারে আমার দেশ। গান থেমে গেল। আসর স্তব্ধ। হঠাৎ সবাই তাকালেন একই দিকে। বস্টন থেকে আসা বৃদ্ধ একজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এবারে সকলেরই কান্নার পালা।

রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি অন্যরকম। আদিম কৌম সমাজের ধারণধারণ অনেকটাই এখনও অবিকৃত আছে। প্রকৃতি সেখানে ক্ষ পাথুরে। গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া কঠিন। সামান্য যে-কটা নালা, পুকুর বা সোঁতা আছে তাও যায় শুকিয়ে। বেশিরভাগ ম ানুষ ভাগ্যবাদী। সবাই চেয়ে আছে আকাশের বদান্যতার দিকে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা কথাগুলি রাঢ় বাংলায় বেম ানান। মানুষের বড় কষ্ট। টাড় জমিতে হাঁটাও কঠিন। কিন্তু লোকসংস্কৃতিতে খুব সমৃদ্ধ। ঝুমুর, টুসু, ভাদু, সেখানে অবিরল বয়ে চলেছে। বাঁকুড়ার কাঁকুরে মাটি দিয়ে পাঁচমুড়ার কুম্ভকাররা আশর্চ্য বিন্যাসের ঘোড়া তৈরি করে চাকা ঘুরিয়ে। সেসব টেরোকোটা ঘোড়া এখন ভদ্রলোকদের গৃহসজ্জার উপকরণ হলেও মূলে তার উৎপাদনের কারণ একেবারে অন্যতম গ্র ামীণ তাৎপর্যে জড়ানো। বংকুড়ার গ্রামগ্রামান্তে দ্রুতগামী বাসে যেতে যেতেও চোখে পড়বেই বট কিংবা অশথ গাছের গুঁড়ির কাছটা সাজানো গোছানো--সেখানে রয়েছে মাটির ঘোড়া আর হাতি, নানা আকারের। আধহাত একহাত থেকে পাঁচ হাত পর্যন্ত লম্বা। এগুলি আসলে মানুষের মতন-করা। কেউ মনে মনে সংকল্প করেছে তার সন্তানের রোগমুক্তি হলে থানে দেবে একটা দুহাত মাপের ঘোড়া। কার মানসিকসন্তান কামনা, কার চাকুরি প্রাপ্তি। কেউ মেয়ের বিয়েরর জন্য মানত করে ঘোড়া বা হাত রেখেছে। ভাবি নয়নমনোহরদৃশ্য। বারবার দেখেছি বাঁকুড়া পুরলিয়া বীরভূম মুর্শিদাবাদ লৌকিক জীবনের ছন্দে সুঠাম। গানে শিল্প কাজে কবিত্বেভরপুর দেশ। প্রকৃতির কাঠিন্য তারা জয় করেছে মনের সৌন্দর্য দিয়ে। ব াইরের অন্যান্য জেলা বা সারা পশ্চিমবঙ্গে অন্য সব জায়গার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কম, ঔৎসুক্যও কম। নিজেরাই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্তত সৃজন সামর্থ্যে।

একসময় চালচিত্রের শিল্পীদের সন্ধানে যখন ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি সারা বাংলা, কে যেন বললেন, রাড়ে গেলে ভিন্নবর্গের চিত্রকর পাবেন, পটুয়াদের দেশ তো ! ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেলাম পোটো বা পটুয়াদের। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ আর মেদিনীপুরে এখনও আছেন অনেক পটুয়া। তাঁদের কাছে গিয়ে নানা খবর মিলল। যেমন ধরা যাক, পটের ছবি আঁকতে তঁ ারা বাইরের রং কেনেন না। কেমন করে কোথা থেকে তবে তৈরি হয় রং?

শ্যামী চিত্রকর আমাকে বুঝিয়ে বললেন, ধন হলুদ রং দরকার, আমরা কী করি জানেন ? উনুনের ঝিঁক বোঝেন তো? রান্ন া করতে করতে আগুনের তাতে হলদে হয়ে গেছে, তাই একটু জলে গুলে নিলেই হয়ে যাবে খাসাহলদে রং। পুঁই মিচুড়ির দানা থেকে আমরা পাই বেগুনি রং। সাদা রং তো চুনেই মিটে গেল। অনেক দিনের মেটে হাঁড়িতে ভুসো পড়ে যায়, তাই দিয়ে হয় মিসকালো রং। আর ওই যে দূরের পাহাড় দেখছেন--- ওর অনেকটা ভেতরে গেলে পাওয়া যায় গিরিমাটি আর দু-একরকম পাথর। তার কোনোটা ঘষে পাই লাল রং, কোনোটায় নীল। হলদের সঙ্গে নীল মেশালেই আসবে সবুজ রং। লাল হলুদে মেশালেই খয়েরি।

চমৎকার বোঝা গেল দেশজ রঙের বৃত্তান্ত। পরে অবশ্য এটাও জানা গেল যে স্যামী চিত্রকরের আরেকটা নাম হল শামীম। সে আধা হিন্দু আবাধ মুসলিম। সব পোটোরাই তাই। এদিকে পুজোআচচা করে আবার নামাজও পরে। পটে হিন্দু পুর ানের কাহিনী কেঁকে গান গেয়ে শোনায় হাটে বাজারে, অথচ মৃত্যুর পরে তাদের কবর হয়। এদেরজীবনধারা বয়ে চলেছে দুই খাতে। দেবীমূর্তি গড়ে, পট আঁকে হিন্দু দেবতাদের কাহিনী নিয়ে, সেই পট দেখিয়ে গান গেয়ে তবে তাদের সম্বৎসরের উদরান্ন জোটে। তাই হিন্দু সমাজেই তাদের চলাচল, বসবাস। অথচ রমজান মাসে রোজা রাখে, বিয়েসাদি হয় নিজেদের ঘরে ঘরে। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয় না।

ঘরেও নেই, ঘাটেও , ঘাটেও নেই মেন একটা মাঝামাঝি জীবন নিয়ে বারি বিপন্ন এই পোটোরা। পটে ছবি আঁকার করণকৌশল ভেদে ঘরানাও আছে। কোনোটার গণকর ঘরানা, কোনো ঘরনাকে বলে মাঝিয়ারা। সেই মাঝিয়ারা ঘরান ার পটুয়া একজনের সঙ্গে আলাপ হল বীরভূমের ষাটপল্সা গ্রামে। তাঁর নাম বাঁকু। বাঁকু পটুয়া।

একেবারে ক্ষয়া চেহারা, একমাথা ঝাঁকড়া চুল, তবে চোখে মুখে বেশ কেটা প্রত্যয়ের ভাব। দীনবেশের দরিদ্র মানুষ। হাটে মাঠে জড়ানো পট দেখিয়ে আর পটের গান গেয়ে গটা পয়সাই বা জোটে ? কিন্তু চমক লাগল যখন জানলাম বাংলার পটের গান গাইতে বাঁকু গেছেন বিদেশে, অবশ্যই ভারত উৎসবের সূত্রে। ১৯৮২ সালে লন্ডন, ১৯৮৫সালে ওয়াসিংটন। কী আশর্চ্য এই পটের গানের ঋিজয়ের বার্তা! অথচ মানুষটির কথাবার্তায় কোনো দম্ভ বা চালাকি নেই। খুব নিস্পৃহভাবে বললেন, ধন, বিদেশে তো রোজ রোজ যাচ্ছি না। দুববার যাবার সুযোগ এসেছে, গেছি। তারপরে আমাদের যে দারিদ্র্য সেই দারিদ্র্যই।

--- বিদেশিরা পটের গান শুনল ?

--- হ্যাঁ শুনল, আদর করে টেপ করল। কিনেও নিল সব কটা পট মোটা দামে। তো ধন সেই টাকায় বড় মেয়েটার বিয়ে দিলাম, ঘরদোর একটু সারলাম, ব্যাস্ টাকা ফৌৎ। কী বুজলেন? তবে হ্যাঁ, ওরা কটা জিনিস উপহার দিয়েছে। টেপ রেকর্ডার, গেঞ্জি, ঘড়ি আর বিস্কুটেরর প্যাকেট। বিস্কুট তো এখানে আনতেই শেষ, ঘড়ি ওই বড়খোকার হাতে দেখছেন। টেপ রেকর্ডার? বেচে দিয়েছি--- টেপ কেনার পয়সা কই? ব্যাটারি কে দেবে? আর গেঞ্জি এই দেখুন পরে যাচ্ছি, কী সব আগডম বাগডম চিত্তির করা।

--- এসব দিল কে ?

--- কেন ? পাবলিক দিয়েছে ভালোবেসে, গালে চুমো দিয়েছে গান শুনে।

আমি অবাক হয়ে বাঁকুর দিকে তাকিয়ে থাকি। বাংলা গানের ঋায়নে ভারতের প্রতিনিধি। কী কশ, কতঅসহায় তার দৈনন্দিন। বাঁকুর ভেতরে কিন্তু একজন প্রর্তয়ী শিল্পীর বসবাস রয়েছে। তাই বলে ওঠেন, তা ধন যতগুলো পট নিয়ে গিয়েছিলাম সব বিকে গঁয়েছে, আবার সব আঁকতে হল এখানে ফিরে।

--- কেন ?

--- বাঃ, ছবি নেই কিন্তু গান তো আছে, সুর আছে, সবই মনের মধ্যে ধরেন জড়ানো। যেমন আমাদের এইজড়ানো পট, টান দিলেন খুলে যাবে। তো সেই গানের বর্ণনা দিয়েই ছবি আঁকা। জানেন, আপনাকে একটা গোপ্ত কথা বলি। আমি একটা আমেরিকা পট এঁকেছি। বাড়ি রাস্তা আলো গাড়ি সব মিলিয়ে। একটা গান্য বেঁধেছি, আজব শহর আমেরিকা তার ধুয়ো। পাবলিক সেটা এখন খুব শুনতে চায়।

এতবড় মাপের সাংস্কৃতিত ঋায়ন ঘটে গেছে কে জানত ? বাঁকু খুব যত্ন করে তাঁর কাঁধে ঝোলানো পটেরভোলা থেকে সম্ভ্রম সহকারে একটা জড়ানো পট খুলে দেখাল আমেরিকা পট। উত্তরা-অভিমন্যু, কর্ণ-কুন্তী, নরকেরবিচার, সীতার পাতাল প্রবেশ, ভীষ্মের শরশয্যা, জয় বাবা তারকনাথ পটের পাশে আমেরিকা পট। গুণগুণ করে গান ধরে দেন

ওয়াসিংটনে যে দেখি ডাইনে গাড়ি চলে।
ওপরে ওঠালে সুইচ ভাই রে আলো জ্বলে।।
কত আলো কত গাড়ি কীবা তাহার গতি।
বাঁকু এসে আমেরিকায় ভাবে মন্দমতি।।

জড়ানো পটের আস্তরণ খোলে আর সামনে ভেসে ওঠে ধনী দেশের নানা বিচিত্র দৃশ্য---পার্ক, হাইরাইজ, পানসালা,নরনারী, সূর্যাস্ত, রাস্তায় গাড়ির জ্যাম এমনকী প্রেমিক প্রেমিকার চুম্বন। আর এইসব নিয়ে পোটের অনবদ্য গানেরবাণী শোনার মতো। আমি বললাম, ও - দেশের লোক এ- দেশের পুরাণের কথাকাহিনী শুনে খুশি হল ?

---- ভাষা বোঝে নাই, তবে গানের সুর আর ছবি কেন বুঝবে নাই গ ? সারা বিশ্ব ওসব বুঝতে কোনো বাধা নেই--- শিশুও ছবি বোঝে গান বোঝে। বোঝে না ?

।।৫ ।।

জয়দেব কেঁদুলির পৌষ সংক্রান্তিরি মেলায় এবার এক নতুন প্রাপ্তিযোগ হল। বেণী মাধবের নামী আখড়ার সারা দিন সারারাত গান হয়। বেণী একটা বড় কাঠের গুঁড়ির ধুনি জ্বালিয়ে গাঁজা খেয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে বসে আছে আর একের পর এক বাউল এসে দলবল নিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে--- শ্রোতাদেরও হেলদোল নেই। তাদের বারো আনাই গাঁজায়আচ্ছন্ন। মাঝে

মাঝে সুধু জিকির দিচ্ছে জয়গু - জয়গু কিংবা বালিহারি - বালিহারি। একজন কমবয়েসী চটকদার বাউল, আলখাল্লার ওপর র-সিল্কের জ্যাকেট পরে গান গাইছিল

কৃষ্ণনামের মিষ্টি চুট মুখে রাখো সর্বক্ষণ।

গলার তেজ আছে। দমও যে আছে সেটা বোজা গেল ভোলানাথ বলে যখন লম্বা টান ছাড়ল। সকলে তাইশুনে একেবারে মোহিত। গানের শেষে দৃপ্তভাবে যেন বিশ্ব জয় করেছে এমন ভঙ্গিতে এসে বসল আমারই পাশে। নতহয়ে নমস্কার জানিয়ে ঝোলা থেকে একখানা সাদা কার্ড বের করে হেসে আমাকে দিল। আমাকে দেখেই ঠাউরেছে একজনশহুরে মানুষ বলে। দেখলাম লেখা রয়েছে ইংরিজি হরফে

Baul Bishwa
The Bauls of Bengal
SUBHA DAS BAUL
119, Rue du Temple – 75003 Paris – France
Tel + Fax : + 331 ৪২ ৭৮ ৫১ ৮৩
e.mail : baulbishwa@aol.com
web : wwwbaulbishaw.com

খানিক পরে বাইরে এসে কথায় কথায় জানা গেল বীরভূমের গদাধরপুরের হাটইকরা গাঁয়ের এই কৃষ্ণকায় বঙ্গসন্তান এখন প্যারিসবাসী। বাউল বিশ্বে যে অবশ্য নিতান্ত কো নয়, সঙ্গে এক শুভ্রকায় সঙ্গিনী আছে। মাখনের মতো যার গাত্রবর্ণে এখন বাংলার গেয়া নামাবলী বেশ সেঁটে বসেছে। বাউল বিশ্বের এই সরণি খুলে গেছে ষাটের দশক থেকে। তার প্রথম পদাতিক নিশ্চয়ই পূর্ণদাস বাউল। তারপরে পবনদাস থেকে বহু মহাজনের সান্নিধ্যধন্য এই পথ। ভারত তথা বঙ্গ সংস্কৃতির বেশ লাভজনক পণ্য এই বাংলার বাউল। চলনে বলনে নাচে ধমকে আর পোশাকে পরিচ্ছদে এক সচল আইকন। সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় মজা করে লিখেছেন The Baul, of course, having been granted cultural benediction in the twntieth by its elevation to the status of an export item in the festival of India circuit। শুধু ভারত উৎসব নয়, বাউলের স্ট্যাটাস নানাভাবেই বেড়ে চলেছে সারা বিশ্বে। তাঁদের রপ্তানি যোগ্যতার কারণ বাউলদের বিচিত্র পোশাক, একতারা, মাথার ধম্মিল্ল কিংবা সাঁইবাবার মতো চূর্ণকুন্তল আর বৃত্তাকার নাচ-- যাকে বলে চমৎকার এক শো - পিস। গাঁজার মাদকে তৃতীয়, তাঁদের সবকিছুই ইউরোপ আর আমেরিকার মুক্ত সমাজে ও যৌনস্বাধীনতায় প্রশ্রয় পায়। তাই দেখে এদেশে নতুন গান লেকা হচ্ছে বাউল গানের হতেছে প্রচার। কালাচাঁদ দরবেশ লিখেছেন তাঁর গানে

বিশ্বাসী হইল ধনী

তারা বাউলের পরশ পেয়েছে।

কে যে প্রকৃতপক্ষে ধনী হল বলা অবশ্য কঠিন। আজকের বিস্তায়িত বাউলের ভিজিটিং কার্ডে রয়েছে ই. মেল আর ওয়েবসাইটের নিশানা অথচ দেড়শো বছব আগে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই বাউলদের সম্পর্কে লিখেছিলেন ব্যগ করে a mad man. A class of beggars who pretend to be mad on account of religious fervour, and try to uphold their pretention by their fantastic dress, dirty habits and queer philosophy of their songs.

আজকের পটপরিবর্তনের অবশ্য বাউলদের বিশ্বপরিক্রমার বহর রেড়েই চলেছে। সেখানে দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে বেশ দেখা যায়। বাউলদের বিদেশি মঞ্চে গান পরিবেশনে যাওয়া - আসা নিয়মিত। একেই কি বলব বাউল গানের বিশ্বায়ন? উলটোটাও সত্যি--- যেমন দেখি বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে সাধন দাসের আখড়ায় এসে ডেরা কেটেছেন জাপানি মাকি কুজুমি। বিসুদ্ধ তানমান লয়ে গাইছেন তত্ত্বহুল লালন গীতি একতারা আর ডুব্‌কি বাজিয়ে স্বচ্ছন্দ দক্ষতায়। এদিকে কলকাতার শহরে মঞ্চে নাগরিক সান্নিধ্য গ্রাম্য বাউল গানের মুখপাতে সদম্ভে বলে এখন যে গানটা গাইব এটা গেয়েছিলাম প্রাঙ্কফুর্টে --- ওরা খুব সমাদর করেছিল। ওরা তো সমবই সমাদর করে। রবিশঙ্কর আলিল আকবরের বাজনা, আমজাদের নিমীলনেত্রে পরিবেশন, অমিতা দত্ত-র নাচ, জগজিতের গজল, অনুপ জালোটার ভজন, সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসংগীত, ভূপেন হাজারিকা বিহুগান, স্বপন বসুর লোকগীতি এমনকী নচিকেতার জীবনমুখী। ওরা একইভাবে মেতে ওঠে লতা-আশার গানে, সতলমন-জুহির নাচে, রোমোর বিভঙ্গে কিংবাশুনু-র কণ্ঠধবনিতে। আসলে এসব তো সংস্কৃতির জনতায়ন, তাতে উৎকর্ষের প্রশ্ন পরে। সবয়েয়ে আগে দরকার প্রাপ্তিযোগ্যতা ও অধিকার। প্রেমের চেয়ে প্রতাম বড়।

ঝিায়নের চাহিদায় আমাদের ফুটতে হবে। তাদের তালে গাঁথো তোমার লয়।
এতক্ষণ ঝি বাউল বা বাউল বিল্পের কথা শোনা গেল। দেয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেয়া-- র তত্ত্বও বেশ বোঝা গেল। সবকিছুর মূলে অবশ্য পণ্যায়ন। বাংলার গান এখন আন্তর্জাতিক বাজারে এক বিত্রয়যোগ্য বস্তু। যেমন প্রতীচীর গানের দীব্র ঝোঁক, চিহ্নীনতা ও ভিডিও -র বিশেষ নর্তন এদেশে আমদানিযোগ্য পণ্য। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বাঁকুড়ার নবাসন গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ বাউল হরিপদ গোঁসাইয়ের একটা মজার গান। প্যারিস শহর দেখেশুনে বাউল লিখেছেন

এসে দেখি আমি এই পেরিস শহরে
দেখি রঙ্গ বিরঙ্গে অনেক মানুষ
সকলকে নেয় আপন করে।
দেখি তাদের এমনই ব্যবহার
নাহি তাদের কেহ আপনপর
হিংসা নিন্দা নাই অন্তর
চুম্বন খায় সবাই সাবাইকে ধরে।
পুষ নারীর নাই কোনো বাধা
এদের অন্তরগুলি বড়ই সাদা
এরা প্রেমে মত্ত সকল সময়
কী ঘরে কী বাহিরে।
তাদের লীলা খেলা বলব কী
যেমন বস্ত্রহারা ব্রজবালা হল উলঙ্গী
উত্তম প্রেমে মত্ত রাতা
রয়েছে নেশার ঘোরে।
হরিপদ কয় সত্যকথা
তোমার মা জননী স্বর্গের দেবতা
তোমরা ইন্দ্রপুরী ত্যাজ্য করি
এসেছে এই পেরিস শহরে।।

এই হল অকটপ বাউলের ঝিদর্শন। বস্ত্রহারা উলঙ্গিনীদের মধ্যে স্বর্গভ্রষ্টা মা - জননীদের খুঁজে পাওয়া --- সে কি সহজ গ ান ?

চেতনা পত্রিকা থেকে সংগ্রীহিত